গুণীজন

আমাদের প্রেরণার উৎস

www.gunijan.org.bd

সম্পাদকীয়

গুণীজন বহুদিন ধরেই চেষ্টা করে আসছে দেশের গুণী ব্যক্তিদের পরিচয় তুলে ধরার। নতুন প্রজন্ম তাদের দেশের সেরা সন্তানদের চিনে নিতে শিখবে—এটাও গুণীজন ট্রাস্টের একটি উদ্দেশ্য। আমাদের দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের (শিক্ষা, সংগীত, সাহিত্য, চিত্রকলা, সমাজ বিজ্ঞান, দর্শন, গণমাধ্যম, নারী অধিকার আন্দোলন, মুক্তিসংগ্রাম ইত্যাদি) গুণীজনদের বেড়ে ওঠার গল্প, তাঁদের অবদান, বিভিন্ন সময়ের আলোকচিত্রের সমন্বয় করার চেষ্টা করছি আমরা। এখন অডিও-ভিডিও সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় সেটাও কাজে লাগানো হচ্ছে।

'গুণীজন' কর্মসূচির আওতায় ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নতুন প্রজন্মের মাঝে বিতরণ করার জন্য ২০০৯ সাল থেকে 'গুণীজন' পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে। এবারের সংখ্যায় চারজন সাহিত্যিকের জীবনী থাকছে। তাঁরা হলেন শওকত আলী, রাজিয়া খান, বশীর আল্-হেলাল ও আবু হেনা মোস্তফা কামাল।

আমাদের এই প্রয়াস স্বার্থক হয়ে উঠবে তখনই, যখন তরুণ প্রজন্ম তাঁদের পূর্বসূরীদের সৃজনশীলতার সঙ্গে পরিচিত হবে এবং তাতে তাদের নিজেদের চলার পথ নির্ধারণ করা সহজ হয়ে উঠবে।

। শওকত আলী ।

যে যুগে মুসলমান মেয়েদেরকে ১০-১১ বছর বয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হত, মুসলমান ছেলেরা তখন শিক্ষিত মেয়ে বিয়ে করার কথা কল্পনাও করত না। কিন্তু সেই সময় শিক্ষিত মেয়ে বিয়ে করার কথা ভেবেছেন খোরশেদ আলী সরকার। কারণ তিনি নিজে পড়াশুনা ভালবাসতেন, প্রচুর বই পড়তেন এবং লেখালেখি করতেন। আর ১০-১১ বছর বয়সে বিয়ের পিঁড়িতে না বসে মোসাম্মত সালেমা খাতুন গিয়েছেন স্কুলে, পড়েছেন বঙ্কিম চন্দ্র আর শরৎ চন্দ্রের প্রচুর বই। বই পাগল খোরশেদ আলী সরকার এবং মোসাম্মত সালেমা খাতুনের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে দু-একজনের কবি-সাহিত্যিক হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। আর তাইতো তাঁদের তৃতীয় সন্তান শওকত আলী হয়েছেন এদেশের স্বনামধন্য সাহিত্যিক।

জন্মসাল নিয়ে অস্পষ্টতা আছে শওকত আলীর। সার্টিফিকেটে তাঁর জন্মসাল ১৯৩৬। তবে তাঁর বাবার ডায়রির খাতায় লেখা আছে ১৯৩৫। তবে দুই জায়গাতে জন্মতারিখ লেখা আছে ১২ ফেব্রুয়ারি। তিনি পশ্চিমবঙ্গের থানা শহর রায়গঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয় শওকত আলী সরকার। তাঁদের পারিবারিক পদবী ছিল প্রথমে প্রধান, তারপর হয় সরকার। তিনি যখন ক্লাস সিক্স-সেভেনে পড়তেন তখন যোগেশ চন্দ্র ঘোষ নামে একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি ক্লাসে এসে প্রথমে একজন ছাত্রকে ডেকে একটা বাংলা বাক্য লিখতে বলতেন। তারপর আর একজনকে ডেকে বলতেন এই বাক্যটির ইংরেজি কর। তারপর বলতেন, শওকত আলী সরকার কান মলা দরকার। বন্ধুরা তাঁকে ক্ষেপাতেন, কীরে কানমলা দরকার তা তুই এখানে কেন? সেজন্য তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনের সময় সরকারটা বাদ দিয়ে দেন।

শওকত আলীর জন্মের পর তাঁর এক বোনের জন্ম হয়। এই বোন জন্মের দু'বছর পর তাঁর মা আবার অন্তঃসত্ত্বা হন। গর্ভের সন্তান জন্মের পর পরই তাঁর সেই বোনটি মারা যায়। তাতে বাবার মনে হয় তাঁর আদরের মেয়ের মৃত্যুর জন্য এই নবজাতক পুত্রটিই দায়ী। সে জন্য তিনি নবজাতকটিকে ইঁদারার পাশে কচুবনে রেখে আসেন। তাঁর দাদী সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে নবজাতকটিকে কোল তুলে মায়ের বুকের কাছে রাখেন। আর ঘরের দরজায় পাহাড়ায় থাকেন যাতে তাঁর ছেলে আর এরকম পাগলামি করতে না পারে। তাঁরা নয় ভাই-বোন। তাঁর মা মারা যাওয়ার পর তাঁর বাবা এক বিধবা মহিলাকে বিয়ে করেন। এই পক্ষের কয়েকজন ভাইবোন আছে। তাঁর বাবা কংগ্রেসি আন্দোলন করতেন। তাঁর মা মুসলিম লীগের পক্ষে ছিলেন কিন্তু তাঁর বাবা মুসলিম লীগের বিপক্ষে এবং কংগ্রেসের পক্ষে ছিলেন। শওকত আলীকে পাঠশালায় ভর্তি করানো হয়েছিল কিন্তু যেতে ভাল লাগত না বলে তিনি পাঠশালায় যাননি।

শওকত আলীসহ তিন সন্তান জন্মের পর তাঁর মা তাঁর বাবার কাছে ইংরেজি শিখবেন বলে বায়না ধরলেন। কিন্তু খ্রিষ্টান মহিলার কাছে মুসলমান মহিলা কেন ইংরেজি শিখবে? এ নিয়ে রায়গঞ্জের অন্যান্য মহিলারা এসে তাঁর দাদীকে কথা শুনাতেন। কিন্তু এসব বাধা সত্ত্বেও মিশন স্কুলের একজন খ্রিষ্টান শিক্ষক রাখা হলো তাঁর মাকে ইংরেজি শেখানার জন্য। তিনি সেই শিক্ষকের কাছে ইংরেজিসহ অন্যান্য সব বিষয় পড়েন। এর কিছুদিন পর তাঁর মা শ্রীরামপুরের টেক্সটাইল ইন্সটিটিউটে ভর্তি হন। মা এখানে ভর্তি হওয়ার কয়েকমাস পর তাঁরা সপরিবারে শ্রীরামপুরে চলে আসেন এবং শ্রীরামপুর মিশনারী স্কুলে শওকত আলীর বাল্য শিক্ষা শুরু হয়। তিনি এখানে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৪১ সালে কলকাতায় বোমা পড়া শুরু হলে আবার সেই রায়গঞ্জে ফিরে এলেন তাঁরা সপরিবারে। রায়গঞ্জে ফিরে এসে তাঁর মা সেখানকার গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দিলেন এবং বাবা ডাক্তারী পেশা শুরু করেন। রায়গঞ্জ করনেশন ইংলিশ হাইস্কুলে শওকত আলীকে ক্লাস থ্রিতে ভর্তি করে দেওয়া হয়।

১৯৫১ সালে তিনি করনেশন স্কুল থেকেই প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। তাঁর স্কুলের শিক্ষকরা প্রায় সবাই ছিলেন হিন্দু। তারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি লিখেছিলেন, 'আপনাদের রেজাল্ট দেখতে ভুল হয়েছে। শওকত আলী প্রথম বিভাগে পাস করতে পারে না।' কারণ তাঁর শিক্ষকরা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, মুসলমানের ছেলে হয়ে তিনি প্রথম বিভাগে পাস করেছেন। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর স্কুলে রেজাল্ট সিট পাঠিয়ে দেওয়া হয় যেটা দেখে শিক্ষকরা নিশ্চিত হলেন যে তিনি প্রথম বিভাগে পাস করেছেন। এরপর ১৯৫১ সালে তিনি কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ভর্তি হন।

এরপর আসে ১৯৫২ সাল। ১৯৫২ সালেই জন্মভূমিকে ত্যাগ করে তাঁরা চলে আসেন পূর্ববাংলার দিনাজপুরে। আর এটি ছিল তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনা। তাঁরা ভাইবোনরা সবাই চলে এলেন কিন্তু তাঁর বাবা জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করতে পারলেন না। তিনি থেকে গেলেন কোলকাতাতে। দিনাজপুরে আসার আগেই তাঁর মা মারা যান। দিনাজপুর জেলা শহরে এসে তাঁরা বাড়ি কিনলেন। ১৯৫৩ সালে তাঁর বাবা চলে এলেন দিনাজপুরে।

রাজনীতির পাশাপাশি তাঁর বাবা লেখালেখিও করতেন। তাঁর লেখা প্রবন্ধ কলকাতার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর আর একটি নেশা ছিল হাত দেখা। তিনি হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলে দিতেন। পাকিস্তান সমর্থন করেননি বলে দেশভাগের সময় তিনি প্রথমে তাঁর ছেলেমেয়েদেরকে দিনাজপুরে পাঠিয়ে দেন কিন্তু তিনি আসেননি। পরে তাঁর বন্ধুরা অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে যখন তাঁকে দিনাজপুরে পাঠিয়ে দিলেন তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন এ দেশ ছেড়ে আর কখনও যাবেন না। এজন্য মুক্তিযুদ্ধের সময় সবাই যখন ভারতে চলে গেলেন তখন তিনি সেখানে যাননি, দিনাজপুরেই তাঁর বাড়িতে রয়ে গেলেন একা। একদিন তাঁর বাড়ির দরজায় টোকা পড়ল। তিনি দরজা খুলে দেখলেন কেউ নেই। দরজায় কে টোকা দিল তা দেখার জন্য তিনি বাড়ির বাগান পার হয়ে বাইরের দরজার কাছে চলে এলেন এবং দেখলেন পাকিস্তানি সেনারা বাড়ির বাইরে টহল দিচ্ছে। তাঁকে দেখে তারা উর্দুতে বলল 'ও ডাক্তার, ওকে মেরে ফেল।' সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলা হল। মেরে ফেলার পর দুই মাস তাঁর মৃতদেহ তাঁর বাড়ির উঠানেই পড়ে ছিল। তারপর জনৈক ব্যক্তি সেই মৃতদেহের হাড়-গোড় নিয়ে যেয়ে তাঁর বাড়ির সামনে কবর দেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হাড়-গোড় তুলে তাঁর নিজের বাড়ির উঠানে কবর দেওয়া হয় এবং শহীদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকায় খোরশেদ আলী সরকারের নাম ওঠে। শহীদ বুদ্ধিজীবীর সন্তান হওয়ায় শওকত আলী গর্ববোধ করেন।

১৯৫১ সালে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে আই.এ. ভর্তি হওয়ার পর ১৯৫৩ সালে শওকত আলী দ্বিতীয় বিভাগে আই.এ. পাস করেন। তখন সুরেন্দ্রনাথ কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন ড. জিসি দেব। তিনি তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। শওকত আলীর শখ ছিল ডাক্তার হওয়ার। সেকারণে তিনি আই.এস.সি. ভর্তি হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দেরীতে ভর্তি হতে আসার কারণে তিনি আই.এস.সি.-তে ভর্তি হতে পারলেন না। ড. জিসি দেব তাঁকে আই.এ.-তে ভর্তি হতে বললেন। আই.এ. পাস করার পর এই কলেজেই বি.এ.-তে ভর্তি হলেন তিনি। কলেজ জীবন থেকেই কমিউনিষ্ট পার্টি করতেন এবং বিভিন্ন মিছিল, আন্দোলনে তিনি থাকতেন। ফলে ১৯৫৪ সালে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হলে তিনি এই বছর এপ্রিলে ধরা পড়েন এবং জেলে যান। ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে তিনি ছাড়া পান। বন্দী অবস্থায় জেলখানাতেই বইপত্র নিয়ে তিনি পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা করেছেন। তাঁর সাথে কয়েকজন শিক্ষকও ধরা পড়েছিলেন, তাঁরা জেলখানাতে তাঁকে পড়াশুনার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন।

জেল থেকে বের হওয়ার বিশ দিন পর টেষ্ট পরীক্ষা দেন। ১৯৫৫ সালে বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে তৃতীয় বিভাগে পাস করেন। এরপর টিউশানী করা শুরু করেন। কিন্তু শওকত আলীর খুব শখ এম.এ. পড়বেন। তিনি নিজে কিছু টাকা জমালেন আর স্কুল টিচার বোন ও বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে ঢাকায় এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম.এ.-তে ভর্তি হলেন। তখন বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। দৈনিক 'মিল্লাত'-এ একটা চাকরির জন্য তিনি সম্পাদকের সাথে দেখা করেন। সম্পাদক সাহেব বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া তাঁর লেখা পড়েছেন এবং পছন্দ হয়েছে। ফলে ১৯৫৫ সালে তিনি দৈনিক 'মিল্লাত'-এ চাকরি পেলেন নিউজ ডেস্কে। এরপর আবার ব্যাপকভাবে ধরপাকড় শুরু হলে তিনি পালিয়ে ঠাকুরগাঁও চলে যান। সেখানকার একটি স্কুলের হেড টিচারকে তিনি বলেন, শুধু থাকা খাওয়ার বিনিময়ে এই স্কুলে একটি চাকুরি দেন, বেতন প্রয়োজন নেই। তবে ৮০ টাকা বেতনে তাঁর সেই স্কুলেই চাকরি হয়ে যায়। এই স্কুলে ৬-৭ মাস থাকার পর তিনি আবার ঢাকায় ফিরে আসেন এবং এম.এ ক্লাসে ভর্তি হন। এরপর তিনি প্রাইভেট টিউশনি শুরু করেন পাশাপাশি বিভিন্ন সংবাদপত্রে চাকরি করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি বাংলায় এম.এ. পাস করেন।

এম.এ. পাস করে তিনি দিনাজপুরে ফিরে যান এবং সেখানকার একটি স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এরপর ঠাকুরগাঁও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ১৯৫৯ সালের শেষের দিকে এই কলেজে যোগ দেন বাংলার শিক্ষক হিসেবে। এই কলেজে থাকা অবস্থায় ১৯৬১ সালে তিনি বিয়ে করেন। মেয়ে ইডেন কলেজের ছাত্রী ছিলেন। সবচেয়ে মজার বিষয় হল স্বামী-স্ত্রীর নাম এক। তাঁর স্ত্রীর নাম শওকত আরা। ঠাকুরগাঁও এ তাঁদের সংসার জীবন শুরু হয়। এর কিছুদিন পরেই তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং ১৯৬২ সালে জগন্নাথ কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত জগন্নাথ কলেজে চাকরি করেন। ১৯৮৮ সালে জেলা গেজেটিয়ারের ঢাকার হেড অফিসে সহকারি পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। অফিসটি এখন উঠে গেছে। ব্রিটিশ আমলে এই অফিসটি তৈরী হয়েছিল। এখানে তিনি পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি পান। ১৯৮৯ সালে তাঁকে সরকারি মিউজিক কলেজের প্রিন্সিপাল করা হয়। এরপর ১৯৯৩ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর তিন ছেলে। তাঁর স্ত্রী মারা যান ১৯৯৬ সালে।

ক্লাস নাইন টেনে-পড়তেই শওকত আলী লেখালেখি শুরু করেন। তবে দেশভাগের পর দিনাজপুরে এসে তাঁর প্রথম লেখা একটি গল্প প্রকাশিত হয় কলকাতার বামপন্থীদের 'নতুন সাহিত্য' নামে একটি পত্রিকায়। এরপর দৈনিক 'মিল্লাত', মাসিক 'সমকাল', 'ইত্তেফাক'-এ তাঁর অনেক গল্প, কবিতা এবং বাচ্চাদের জন্য লেখা প্রকাশিত হয়। ১৯৬৪ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পিঙ্গল আকাশ' প্রকাশিত হয়। এটি একটি ছোট উপন্যাস। এরপর প্রকাশিত হয়েছে 'ওয়ারিশ', 'প্রদোষে প্রাকৃতজন', 'উত্তরের খেপ'সহ আরও অনেক বই। তিনি শিশু কিশোরদের জন্যও লিখেছেন। 'ওয়ারিশ' উপন্যাসে চারটি প্রজন্মের চিন্তাভাবনা ও জীবন যাপনের ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে একটি আত্ম-আবিস্কারের কাহিনি গভীর বিশ্বস্ততার সাথে নির্মিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে 'ওয়ারিশ' অবশ্যই বিশিষ্ট সংযোজন।

বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও একুশে পদক ছাড়াও তিনি ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ লেখক শিবির কর্তৃক হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৮৩ সালে তাঁকে অজিত গুহ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৬ সালে ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার এবং ১৯৮৯ সালে আলাওল সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হয়।

তথ্যসূত্র: আগষ্ট, ২০০৯ সালে শওকত আলীর সরাসরি সাক্ষাৎকার নিয়ে লেখাটি তৈরী করা হয়েছে।

লেখক : মৌরী তানিয়া

রাজিয়া খান

রাজিয়া খান ১৯৩৬ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা তমিজউদ্দিন খান অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী, আইন সভার সদস্য এবং জাতীয় পরিষদের স্পীকার ছিলেন। তিনি বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারাভোগ করেন। মা রাবেয়া রাহাত খান।

ছোটবেলা থেকেই পারিবারিক পরিবেশ রাজিয়া খানের মধ্যে প্রগতিবাদী চেতনা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। পরবর্তীতে সাংসারিক জীবনেও তিনি সে ধারা বজায় রাখেন। রাজিয়া খানের স্বামী আনোয়ারুল আমিন ব্যাংকার ছিলেন। এক ছেলে কায়সার তামিজ আমিন ও এক মেয়ে আশা মেহরিন।

কলকাতায় ছিলেন ১০ বছর। তখন তাঁর বয়স দশ বছর। শৈশবের সেই স্মৃতি, কলকাতার সেই রূপ তাঁর লেখায় বারবার ফিরে এসেছে। সেই সময় কলকাতা ছিল বিরাট মেট্রোপলিটন শহর, কলকাতা শহরের সাংস্কৃতিক অঙ্গন ছিল বিশাল উদার। মুসলমান হিন্দুর বিভেদ তখনও তৈরি হয়নি। বৃটিশরা নানা ধরনের জটিলতা তৈরি করলেও সাধারণ মানুষের জীবনে তখনও তাঁর কোনও প্রভাব ছিল না। খুব স্বাভাবিকভাবেই কলকাতার সেই উচ্ছল জীবন তাঁর শৈশবে প্রভাব ফেলেছিল এবং তিনি সারাজীবন সেই আনন্দময় স্মৃতি মনে রেখেছেন।

'আমি ছোট থেকেই স্বাধীনচেতা ছিলাম। রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হয়ে উর্দু হবে শোনার পর থেকেই ভীষণ খারাপ লাগছিল। চারিদিকে উত্তাল আন্দোলন থেকে প্রেরণা পাচ্ছিলাম। কিন্তু কিছু করার ইচ্ছা থাকলেও কি করব বুঝতে পারছিলাম না। সেই সময় আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা সামনে। চাইলেও ঠিকভাবে নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব ছিল না। নিজেদের বাসা রেখে মামা বাড়ি গেন্ডারিয়ার পাঠিয়ে দিল বাড়ির সবাই যাতে ঠিকমত পড়াশুনা করতে পারি। আমার অভ্যাস ছিল নাটক করা আর ঘুরে বেরানো। কিন্তু মামা বাড়িতে মামা বাড়ির বাইরে বেরুনোই বন্ধ করে দিল। আর এর মধ্যেই দোকান থেকে কালি কিনে এনে পোস্টার লাগিয়ে আশেপাশের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বাড়ির গৃহিনীদের একত্রে করে একটা শোভাযাত্রা করি।' ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচারণ করেছেন তিনি এভাবে।

অবজারভারে কাজ করার সময়কার কথা বলতে গিয়ে রাজিয়া খান বলেন, 'ইংল্যান্ড থেকে এসে অপেক্ষা করছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির জন্য। এই সময় অবজারভার থেকে বলা হলো সপ্তাহে তিনটি করে সম্পাদকীয় লেখার জন্য। কাজটা এতো চ্যালেঞ্জিং ছিল যে আমার তা ভালো লাগতো। সেখানে 'সান ডে ম্যাগাজিন' এডিট করতাম, নিজের একটা কলাম ছিল সেটার কাজ করতাম, বই এর রিভিউ, নাটকের রিভিউ করতাম যা আমার কাছে খুবই ভালো লাগতো। সম্পাদকমন্ডলীতে কাজ করার অভিজ্ঞতার বেশ ভালো ছিল। বর্তমান সময়েও সাধারণত কোনও মেয়েকে এডিটরিয়াল বোর্ডে কাজ করতে দেখা যায় না। সেখানে আমার কাজটা চ্যালেঞ্জিংতো বটেই।'

মেয়েদের কাজটাকে সাধারণত কেউ মনে রাখে না আর সেটার স্বীকৃতিও দেয় না। তবে এই অবস্থার কারণ মেয়েরাই। এখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজই শুধুমাত্র দায়ী নয়। আমরা প্রায়ই মেয়েদের সব বিষয়ই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের উপর চাপিয়ে দেই যেটা মোটেও ঠিক না। আমাদের সমাজে এমন অনেক পুরুষ আছেন যাদের অনেক কাজের স্বীকৃতি সমাজ দেয় না। তাই সার্বিক বিষয়টি হচ্ছে সমাজে কাজের স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য না ভেবে কাজ করে যাওয়া। রাজিয়া খান নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁর পূর্ণ সমর্থনের কথা বলেন, তবে নারীদের আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে এবং প্রাথমিক সংগ্রামে নারী সমাজ অনেক এগিয়ে গেছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। এখানে প্রাথমিক সমাজ বলতে তিনি সমাজের সেই শ্রেণীকে বুঝিয়েছেন যারা কম মজুরিতে দৈনিক বা মাসিক আয়ে কাজ করেন। এই শ্রেণীর নারীরা এখন নিজেদের অধিকার নিয়ে লড়াই করতে পারছে। মজুরি বৈষম্য যারা তৈরি করছে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারছে। অধিকার আদায়ের এই সংগ্রামে নারী পুরুষ উভয়ের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত জরুরি। এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে সব সমাজেই নারীর সম-অধিকার দাবি সফল হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

রাজিয়া খান কলকাতা ও করাচিতে স্কুল, কলেজ জীবন সমাপ্ত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্স ও এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম হন। ব্রিটিশ কাউন্সিলের স্কলারশিপ নিয়ে ইংল্যান্ডে পড়তে যান। সেখান থেকে তাঁর পিএইচ.ডি. ডিগ্রির সব কাজ সমাপ্ত করে কলকাতায় আরও কিছু রিসার্চ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি বিভাগে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার পর তিনি কর্মজীবনের শুরু করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক হিসেবে। পরবর্তীতে ইংল্যান্ড থেকে ফিরে তিনি অবজারভার পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলিতে যোগ দেন। পাশাপাশি কাব্যচর্চায় গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন। এখানে তাঁর লেখা ব্যঙ্গ কলাম- 'কালচার কেটল' তীক্ষ্ণ লেখনীর জন্য জনপ্রিয় হয়। ১৯৫৮ সাল থেকে সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে পুনরায় শিক্ষকতার জীবন শুরু করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনা করেন এবং এই বিভাগের প্রধান হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

শিক্ষকতা ছাড়াও তিনি দেশের খ্যাতনামা বিভিন্ন সংবাদপত্রে সাংবাদিক ও সম্পাদক রূপে কাজ করেছেন। ড. রাজিয়া খান ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ-এ ইংরেজি বিভাগের ডিন হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

রাজিয়া খান পঞ্চাশ দশকে সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুরাগী ও প্রগতিবাদী লেখিকা হিসেবে সাহিত্যের অঙ্গনে এগিয়ে আসেন। লেখিকা হিসেবে তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। মূলত কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও পরে উপন্যাসিক হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১৮ বছর বয়সে লেখা 'বটতলার উপন্যাস' ব্যাপকভাবে সাহিত্যাঙ্গনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁর মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস 'দ্রৌপদী' এপার ওপার দুই বাংলায় সমাদৃত। তাঁর জনপ্রিয় বই 'বটতলার উপন্যাস' (১৯৫৯) ও 'অনুকম্প' (১৯৫৯)। যে উপন্যাসগুলো এক সূত্রে গ্রথিত তার নাম প্রতিচিত্র (১৯৭৫), 'চিত্রকাব্য' ও 'উপসংহার'। অন্যান্য বই- 'অনুকম্প', 'Argus under Anaesthesia, cruel April,' 'সোনালী ঘাসের দেশ' (বাংলা কবিতা), 'চিত্রকাব্য', 'হে মহাজীবন', 'নোংরা নাটক : তিনটি একাঙ্কিকা', 'আবর্ত' (পি.ই.এন. পুরস্কৃত নাটক), 'তমিজুদ্দিন খানের আত্মকথা' (বাংলা অনুবাদ)। 'দ্রৌপদী', 'পাদবিক', 'Multi Dimensional vision in George Eliot, A Different spring', জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ।

মঞ্চ অভিনয়ে এক সময় রাজিয়া খানের দৃপ্ত পদচারণা ছিল। মাত্র ১৪/১৫ বছর বয়সে নাটক 'পাগল হাওয়া'য় অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি মঞ্চে কাজ শুরু করেন। এরপর 'বিজয়া' নাটকে মালিনী'র ভূমিকায় অভিনয় করেন। স্কটরস ক্লাবের নাটকে। মুনীর চৌধুরী ছিলেন 'বিলাসবিহারী'। এরপর মঞ্চের সঙ্গে জড়িয়ে যান। অভিনয় করেন 'নীলদর্পন', 'মেঘমুক্তি', 'দুইপুরুষ', 'বিদ্রোহী পদ্মা'য়। 'কৃষ্ণকুমারী'তে অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চ অভিনয়ের ইতি টানলেও সত্তরের দশকে ইংরেজী 'রক্তকরবী'তে অভিনয় করেন।

'এছাড়াও বেতারের ভার্সিটি ম্যাগাজিনে 'Oliver Twist, Anthony & Cleopatra, Antigone' Ges 'Mid-Summer Nights Dream'- এ অভিয়ন করি'- বললেন রাজিয়া খান।

রাজিয়া খান চলচ্চিত্র অঙ্গনের সঙ্গেও দীর্ঘ দিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আসীন ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনে যুক্ত ছিলাম দীর্ঘদিন। আমার 'Youth Film Society'-র সেক্রেটারী ছিল বর্তমানের শিল্পপতি আজম চৌধুরী। চলচ্চিত্র অনুদান কমিটি, চলচ্চিত্র পুরস্কার কমিটি, সেন্সর বোর্ডে ছিলাম অনেক দিন।' ড. রাজিয়া খান অনেকবার যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, মিশর, হংকং, জাপান, ভারত, সিঙ্গাপুর ও আরব দেশ সফর করেন। এর মধ্যে রয়েছে ১৯৭৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ। ১৯৭৮ সালে দিল্লিতে কমনওয়েলথ লেখক সম্মেলনে 'বাংলাদেশের কবিতা' শীর্ষক ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯০৫ সালে ভেনিসে পি.ই.এন সম্মেলনে প্রবন্ধ পাঠ করেন। এছাড়া ১৯৮৪ সালে চীন সরকারের আমন্ত্রণে চীনে যান।

রাজিয়া খান তাঁর সাহিত্য কর্মের জন্য ১৯৭৫ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। 'আর্বত' নাটকটি পি.ই.এন. পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। ১৯৯৭ সালে একুশে পদকে ভূষিত করা হয় (শিক্ষার জন্য)। রাজিয়া খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট কার্যকরী সংসদ, ফিল্ম সেন্সর বোর্ড, জাতীয় চলচ্চিত্র বিচারক কমিটির সদস্য এবং রোকেয়া হলের প্রভোস্ট (১৯৭৭) ছিলেন। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ফেডারেশনের সহসভাপতি হিসেবে পর্তুগালে চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকও নির্বাচিত হন। তিনি বহু সাংস্কৃতিক, সামাজিক সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক ও বাংলা একাডেমীর ফেলো ছিলেন।

মৃত্যু

রাজিয়া খান ২০১১ সালের ২৮ ডিসেম্বরে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন।

লেখক : কামরুন নুমুর

। বশীর আল্-হেলাল ।

তখন বশীর আল্-হেলালের বয়স তিন কি চার বছর। হাতেখড়ি হবে এই ছোট্ট ছেলেটির। তাঁর মা তাঁকে পরালেন নতুন জামা, আর চন্দন বেটে কপাল জুড়ে প্রলেপ দিয়ে সাজালেন। মূল বাড়ি থেকে একটু দূরে বৈঠকখানায় বসে আছেন বাবা। এই ঘরেই তাঁর ভাই-বোনসহ অনেক আত্মীয়-স্বজন অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে। নতুন জামা আর কপাল জুড়ে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে সাজিয়ে ছোট্ট ছেলেটিকে মা নিয়ে এসে বাবার কোলে বসিয়ে দিলেন। বাবা তাঁর নিজ হাতে তৈরী একটি কলম ছেলেটির ছোট্ট কোমল হাতে ধরিয়ে দিলেন। সেই ছোট্ট হাতটি বাবা তাঁর নিজ হাতে শক্ত করে ধরে কলমটি চন্দনের মধ্যে চুবিয়ে কাঠের তক্তিতে লিখলেন, 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম'। শুরু হল বশীর আল্-হেলালের লেখাপড়া। তখন কি তাঁর মা-বাবা জানতেন এই ছেলেটি একদিন হবেন বাংলাদেশের শক্তিমান কথা সাহিত্যিক। আর তাঁর হাতেই একদিন রচিত হবে অনেক গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ গবেষণার বইসহ আরও অনেক বই।

বাংলাদেশের এই শক্তিমান কথা সাহিত্যিকের জন্ম ১৯৩৬ সালে ৬ জানুয়ারী। মুর্শিদাবাদ জেলার তালিবপুর গ্রামের মীর পাড়ায়। তালিবপুর মুর্শিদাবাদের একটি বৃহৎ ও বিখ্যাত গ্রাম। তালিবপুর গ্রামটি কান্দি মহকুমার ভবপুর থানার অন্তর্গত ও সালার রেলষ্টেশনের কাছে। বশীর আল্-হেলালের জন্মগ্রাম তালিবপুরে জন্মেছিলেন প্রখ্যাত পল্লীগীতি শিল্পী আব্দুল আলীম ও ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদ আবুল বরকতসহ শত কবি-সাহিত্যিক, সংগ্রামী ও বিপ্লবী।

বশীর আল্-হেলালের পূর্ব-পুরুষেরা ১২ প্রজন্ম পূর্বে ইরাকের বাগদাদ থেকে ভারতে এসেছিলেন। ভারত উপমহাদেশ তখন থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ছিল। মূলত ধর্ম প্রচারের জন্য তাঁর পূর্ব-পুরুষগণ এখানে এসেছিলেন। এখানে এসে তাঁরা মুর্শিদাবাদ এলাকায় বসবাস শুরু করেন। তাঁর বাবার নাম সৈয়দ মুহাম্মদ আলী আসমার। বাবা উত্তর ভারতের দেওবন্দ, বেনারস, রামপুর ইত্যাদি স্থানে শিক্ষা লাভ করেন এবং ওই সমস্ত অঞ্চলে শিক্ষকতা করেন। তিনি আরবী-ফার্সী-উর্দু ভাষায় পুতি ছিলেন। আরবী-ফার্সী-উর্দু ভাষায় অসাধারণ পান্ডিত্যের জন্য সমগ্র ভারতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া তিনি মৌলবী ও ইউনানী পশু চিকিৎসক ছিলেন।

তাঁর বাবা ফার্সী ও আরবী ভাষায় লেখালেখি করতেন। তিনি মূলত ফার্সী ভাষার একজন শক্তিমান সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি উর্দু ভাষায়ও লিখতেন। তবে তিনি বাংলা সাহিত্য কম জানতেন। বাংলায় ভাল কথা বলতে পারলেও লিখতে পারতেন না।

বশীর আল্-হেলালের মায়ের নাম আ-মাতার রোকেয়া (রোকেয়া খাতুন)। তিনি বাংলা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাননি। তিনি কেবল প্রথাগত ভাষা জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

বশীর আল্-হেলালের পিতামহ ছিলেন আবুল মুজফফর। তিনি দীর্ঘদিন দার্জিলিঙের একটি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। তিনিও ছিলেন বিশিষ্ট ফার্সী কবি। তাঁর কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিলো।

সৈয়দ মুহাম্মদ আলী আসমার ও আ-মাতার রোকেয়া পরিবারে ১২টি সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু অধিকাংশই কৈশোর অতিক্রম করার পূর্বেই মারা যান। মেয়ে সন্তানের মধ্যে কেবল ওয়াকেফাতুল আহাদ বিয়ে হওয়ার পর মারা যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের পরিবারে বেঁচেছিলেন ৩টি ছেলে সন্তান। নেয়ামাল ওয়াকিল (জন্ম ১৯২৬), নেয়ামাল বাসির (জন্ম ১৯৩২) ও নেয়ামাল বশীর (জন্ম ১৯৩৬)। নেয়ামাল ওয়াকিল ছিলেন কথাশিল্পী ও নাট্যকার। তিনি ১৯৬৫ সালে কলকাতায় স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। নেয়ামাল বাসির পাকিস্তান সরকারের পার্লামেন্টের সেক্রেটারি ছিলেন। স্বাধীনতার পরে তিনি বাংলাদেশ পার্লামেন্টের সেক্রেটারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট অনুবাদক, ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক। নেয়ামাল বাসির ও নেয়ামাল বশীর দু'ভাইয়ের নাম প্রায় একই রকম এবং তাঁরা দু'জনই লেখালেখি করতেন, ফলে তাঁদের লেখা যখন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হতো তখন পাঠকরা দ্বিধায় পড়ে যেতেন আসলে লেখাটি কার। আর এ সমস্যা সমাধানের জন্য নেয়ামাল বশীর পরবর্তীতে তাঁর নাম পরিবর্তন করে বশীর আল্-হেলাল রাখেন।

বাবার কাছে পড়াশুনায় হাতেখড়ি হওয়ার পর বশীর আল্-হেলাল ভর্তি হন তালিবপুর পাঠশালায়। তিনি চতুর্থ শ্রেণীতে ২ টাকা বৃত্তি পান। এরপর ভর্তি হন তালিবপুর গ্রামের এইচ.ই. হাই স্কুলের প্রাইমারী সেকশনে। সেখানে তিনি ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন।

১৯৪৭ সালে বশীর আল্-হেলালের দু'ভাই পূর্ব বাংলায় চলে আসেন। কিছু দিন পর তিনিও পূর্ব বাংলার রাজশাহীতে মেজ ভাইয়ের কাছে চলে আসেন। ৭ম শ্রেণীতে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। রাজশাহীতে এক বছর পড়াশুনা করার পর সেতাবগঞ্জ হাই স্কুলে ৯ম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই মেট্রিক পাশ করেন। মেট্রিক পাশ করার পর ১৯৫২ সালে তিনি আবার জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গে ফিরে যান। ওই সময় পাকিস্তানে যাওয়া আসার জন্য ভিসা লাগতো না। তখন তাঁর মামাদের ব্যবসা ছিল কলকাতায়। তিনি কলকাতার সরকারি কলেজে ভর্তি হলেন এবং মামাদের বাসায় থাকা শুরু করলেন। ১৯৫৪ সালে এই কলেজ থেকে ২য় বিভাগে আই.এ. পাশ করেন। এরপর তিনি জলপাইগুড়ির এ.সি. কলেজে বাংলায় আনার্সে ভর্তি হন। এই কলেজ থেকে ১৯৫৭ সালে ২য় বিভাগে অনার্স পাশ করার পর তিনি কলকাতায় চলে যান। সেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। ওই সময় তিনি রাজনীতির সাথে যুক্ত হন এবং বামপন্থী রাজনীতি শুরু করেন।

বামপন্থী ছাত্র রাজনীতিতে তিনি অনেকদিন যুক্ত ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি কলকাতা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন এবং লাল কার্ড পান। তখনকার দিনে লালকার্ড পাওয়া খুব সহজ ছিলো না। ১৯৫৬ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২য় বিভাগে বাংলায় এম.এ. পাশ করেন। ততদিনে তিনি লেখক হিসেবেও সুনাম অর্জন করেছেন। ছাত্র রাজনীতি ও কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির পাশাপাশি তিনি প্রচুর পড়তেন এবং লেখালেখি করতেন। ওই সময় কলকাতা থেকে তাঁর প্রথম গল্পের বই বের হয়।

এম.এ. পাশ করার পর বশীর আল্-হেলাল কলকাতায় হজ কমিটিতে চাকরি নেন। তখন মাওলানা আযাদের ছেলে আকরাম খান কোলকাতা থেকে একটি পত্রিকা বের করতেন। পত্রিকাটি সপ্তাহে ৩ দিন বের হতো। এটা মুসলমানদের পত্রিকা ছিল। হজ কমিটিতে চাকরির পাশাপাশি তিনি এই পত্রিকায়ও চাকরি করতেন। তিনি সাংবাদিকতা ও চাকরির পাশাপাশি লেখালেখি অব্যাহত রাখেন। তাঁর বাবা ফার্সী, উর্দু ও আরবী ভাষায় লেখালেখি করলেও বশীর আল্-হেলাল ছোট বেলা থেকে মাতৃভাষা বাংলায় লিখতেন।

১৯৬৮ সালের প্রথম দিকে তিনি তাঁর মাকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। তখন পরিস্থিতি ভাল ছিল না বলে ভারত থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। তাঁর মেঝ ভাই তখন ঢাকায় পাকিস্তান সরকারের চাকরি করতেন। ঢাকায় আসার পর তাঁর চোখের সামনে একে একে ঘটে গেল ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০'র নির্বাচন ও ১৯৭১'র মুক্তিযুদ্ধ। আর এসব আন্দোলন-সংগ্রামে তিনিও সামিল হয়েছিলেন।

১৯৬৯ সালে তিনি ফিরোজা বেগমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ফিরোজা বেগম সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তাঁদের পরিবারও দেশবিভাগের পর ভারত থেকে পূর্ববাংলায় চলে আসেন। এই দম্পতির এক ছেলে ও এক মেয়ে। পড়াশুনা শেষ করে তাঁরা এখন চাকরি করছেন।

মাকে নিয়ে ঢাকায় আসার পর বশীর আল্-হেলাল বিভিন্ন বইয়ের সমালোচনা লেখা শুরু করেন। যা ওই সময় খুব কম লেখা হতো। আর শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী মহল ছাড়া এসব বিষয় তেমন কেউ পড়তেন না। বছর খানেকের মধ্যে তিনি শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী মহলে বেশ পরিচিত হয়ে ওঠেন। ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে বাংলা একাডেমীতে চাকরীর জন্য আবেদন করেন। ১৯৬৯ সালে সহ-অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হলেন বাংলা একাডেমীতে। সর্বশেষে তিনি বাংলা একাডেমীর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৩ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। দীর্ঘ প্রায় ২৪ বছর তিনি বাংলা একাডেমীতে চাকরী করেছেন।

বশীর আল্-হেলাল মূলত কথাসাহিত্যিক হিসেবে সুনাম অর্জন করলেও গল্প, উপন্যাস, কবিতা, অনুবাদ ও প্রবন্ধ-গবেষণায়ও তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

তাঁর বড় ভাইয়ের কাছ থেকেই মূলত লেখালেখির ব্যাপারে উৎসাহ পেয়েছিলেন। ছেলেবেলায় তিনি গল্পের বই পড়তে খুব ভালবাসতেন। সেইসময় গল্পের বই পড়ার পাশাপাশি নিজেও গল্প লিখতেন এবং তা বড় ভাইকে দেখাতেন। তাঁর ভাই বলতেন, খুব ভাল হয়েছে। ছেলেবেলায় যে গল্পগুলো লিখতেন সেগুলোর বেশীর ভাগই ছিল ইসলামী। নিজে নিজে গল্প বানিয়ে তিনি সহপাঠীদের শোনাতেন। সহপাঠীরা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন।

৭ম শ্রেণী থেকেই তাঁর লেখালেখির শুরু। ৮ম ও ৯ম শ্রেণীতে পড়ার সময় তিনি লেখালেখির প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। এ সময় ছোট কাগজে-পত্রিকায় লেখা দেয়া শুরু করেন। ওই সময় খুবই ধার্মিক ছিলেন তিনি। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনী তাঁর প্রায় মুখস্ত ছিল।

তিনি যখন ১০ম শ্রেণীতে পড়তেন তখন রচনা প্রতিযোগিতায় একবার হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর প্রবন্ধ লিখে পুরস্কার হিসেবে একটা ঘড়ি পেয়েছিলেন। ওই সময় থেকে তাঁর লেখা 'আজাদ' আর 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। তিনি যখন আই.এ. পড়তেন তখন 'দৈনিক পাকিস্তান'সহ পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি পত্রিকায় লিখতেন।

তিনি অসংখ্য গল্প লিখেছেন। এ পর্যন্ত তাঁর ৬টি গল্পের বই বেরিয়েছে। সেগুলো হলো- 'স্বপ্নের কুশীলব', 'প্রথম কৃষ্ণচূড়া', 'আনারসের হাসি', 'বিপরীত মানুষ', 'ক্ষুধার দেশের রাজা', 'গল্প সমগ্র'প্রথম খন্ড।

গ্রামীণ ও শহুরে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনকে আরো অর্থবহ করতে তিনি জীবনধর্মী ও সমাজসচেতনতামূলক ছোটগল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। বশীর আল্-হেলালের সকল সৃষ্টি-কাজে প্রধানত গ্রামীণ ও শহুরে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন ধারণের চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি বেশ ক'টি উপন্যাস লিখেছেন। এ পর্যন্ত তাঁর ৬টি উপন্যাস বেরিয়েছে। সেগুলো হলো- 'কালো ইলিশ', 'ঘৃতকুমারী', 'শেষ পানপাত্র', 'নূরজাহানদের মধুমাস', 'শিশিরের দেশে অভিযান' ও 'যে পথে বুলবুলিরা যায়'।

বশীর আল্-হেলাল একজন সাহিত্য সমালোচক হিসেবেও সবার কাছে পরিচিতি লাভ করেন। সাহিত্যের নানা বিষয় নিয়ে সমালোচনা লিখেছেন। ১৯৬৮ সালে ঢাকাতে আসার পর সাহিত্য সমালোচনা লিখতে শুরু করেন। ওই সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রিকায় অসংখ্য কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও উপন্যাসের উপরে সমালোচনা লিখেছেন, যা সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশে যে ক'জন প্রবন্ধ-গবেষক রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বশীর আল্-হেলাল। বাংলা একাডেমীতে চাকরি করার সময় তিনি প্রবন্ধ-গবেষণার কাজ শুরু করেন। ভাষা-সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করে তিনি বেশ কয়েকটি বিষয়ের উপর বই লেখেন। বানান, উচ্চারণ ও পরিভাষা প্রয়োগের বিষয়ে প্রশিক্ষণের উপরেও তিনি কাজ করেছেন।

তাঁর প্রবন্ধ-গবেষণার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই হলো : 'আমাদের কবিতা', 'বাংলা গদ্য', 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস', 'বাংলা একাডেমীর ইতিহাস', 'আদর্শ বাংলা বানান', 'বাংলা ভাষার নানান বিবেচনা', 'বাংলা উচ্চারণ', 'কিশোর বাংলা উচ্চারণ মঞ্জুরী', 'ভাষা আন্দোলনের সেই মোহনায়' ও 'আমাদের বিদ্বৎসমাজ'।

প্রশাসনে বাংলা ভাষা প্রচলন ও ভাষা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও তাঁর যথেষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। স্বাধীনতার পরে সরকারী অফিস-আদালতে বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য বিশেষ করে বাংলা একাডেমীর প্রতিনিধিরূপে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এসময় তিনি অফিসের কাজের যাবতীয় কাগজ-পত্র বাংলায় অনুবাদ করে দেন। বাংলা একাডেমীর ছোটদের অভিধান সম্পাদনা পরিষদের একজন সদস্য ছিলেন। তিনি বাংলা একাডেমীর প্রশাসনিক পরিভাষা'র সংকলন সম্পাদনার কাজ করেন।

তিনি একজন অনুবাদক। শুধু ইংরেজী নয়, ইংরেজী ছাড়াও তিনি একসময় উর্দু-ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তাঁর যে অনুবাদ বইগুলো বের হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো- 'এশিয়ার লোককাহিনী' প্রথম খন্ড, 'যুগোস্লাভিয়ার ছোটগল্প', 'দেশে আসা' ও 'হামিদুর রহমান রিপোর্ট'।

বাংলা একাডেমী থেকে অবসর নেয়ার পর তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় রাজনৈতিক কলাম লেখা শুরু করেন। শুধু 'দৈনিক বাংলা'-য় তাঁর ১৬৫টি নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল। এছাড়া অন্যান্য পত্রিকায়ও তাঁর বেশ কটি নিবন্ধ ছাপা হয়। এগুলো ছিল রাজনৈতিক নিবন্ধ।

বশীর আল্-হেলাল কবিরূপে তেমন পরিচিত নন। কিন্তু তিনি কবিতা লেখেন। কবিতার ক্ষেত্রে তিনি নমনীয়। তিনি মনে করেন, কবিতার চিরায়তকে কম-বেশী হোক সবসময় প্রবাহিত রাখা চাই। মজার কথা তিনি কবিতা লেখার জন্য নিজস্ব একটা ফর্ম তৈরী করে নিয়েছেন। এর নাম ভণিতা কবিতা। অর্থাৎ ১০ লাইনের এই কবিতাগুলোর শেষের দুই লাইনের মধ্যে কবির নাম থাকে। কবিতার প্রতিটি লাইনের শেষ শব্দের ছন্দের সাথে পরের লাইনের শেষ শব্দের ছন্দের মিল থাকে।

বশীর আল্হেলাল-এর ভণিতা কবিতার একটি নমুনা :

চিঠির বাক্সে চিঠি আছে, পায়ে আমার বাত
ও মেয়ে, ওটা এনে দিবি? নামছে আঁধার রাত
আঁধার রাতে অন্ধ আমি, সকাল হওয়ার পরে
দেহ খাঁচায় তখনো পাখি থাকবে ধৈর্য ধরে
আশা আছে এতটুকু দে রে এনে দে চিঠিখানা
এই শেষবার সে লেখে নি আ' ভুল ঠিকানা
চিঠিটা যদি বড় হয় ধর বড় হয় পাতা দুই
ইতিতে প্রথমে দেখে নেবে সেই নীল রঙে সাদা জুঁই
বশীর আল্-হেলাল বলে এই বুড়ো কেন এত তোর আশা
আয়ুর অধিক হয় নাকি রে লম্বা ভালোবাসা।

বশীর আল্-হেলাল তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হল : আলাওল সাহিত্য পুরস্কার- ১৯৯১, বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার-১৯৯৩, লেখিকা সংঘ পুরস্কার, গৌরী ঘোষাল স্মৃতি সম্মান পুরস্কার- ২০০২ কলকাতা ও অধ্যাপক আবুল কাসেম পুরস্কার- ২০০৪।

তথ্যসূত্র : জুন, ২০০৯ তারিখে বশীর আল্হেলালের সরাসরি সাক্ষাৎকার নিয়ে জীবনীটি লেখা হয়েছে।
লেখক : মৌরী তানিয়া এবং শেখ রফিক

।আবু হেনা মোস্তফা কামাল।

বাল্যকালেই গানের চর্চা শুরু করেছিলেন তিনি। হতে চেয়েছিলেন গায়ক। মানুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে নিজেকে বোঝার ক্ষমতা বাড়ে। আবু হেনা মোস্তফা কামালও পরে বুঝেছিলেন গাওয়া নয়, লেখার প্রবণতায় বাঁধা তাঁর জীবনের তার। লেখালেখির শুরুতে তাই কবিতা ও গান রচনার প্রতি ছিল তাঁর ঝোঁক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকা অবস্থাতেই রচনা করেছেন অনেক কালজয়ী গান। গীতিকার হিসেবে ওই বয়সেই পেয়েছেন ঈর্ষণীয় সাফল্য। তবে শুধু কবি ও গীতিকার নয় বহু পরিচয়ে বিশিষ্ট ছিলেন আবু হেনা মোস্তফা কামাল। তিনি ছিলেন একাধারে একজন গীতিকার, কবি, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, অধ্যাপক, গায়ক, বাগ্মী ও টেলিভিশনের উপস্থাপক। প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তিনি।

পাবনা জেলার পাবনা থানার গোবিন্দা গ্রামে ১৯৩৬ সালের ১৩ মার্চ আবু হেনা মোস্তফা কামালের জন্ম। বাবা এম. শাহজাহান আলী ছিলেন প্রথম জীবনে স্কুলশিক্ষক, পরে কোনো অফিসের হেডক্লার্ক। অকালেই মারা যান তিনি। আবু হেনা মোস্তফা কামালের মা খালেসুননেসা দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। গান ভালো গাইতেন। ছেলেমেয়েদের মানুষ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তিনি। আবু হেনা মোস্তফা কামালরা ছিলেন তিন ভাইবোন। সবার বড় বোন সাবেরা খাতুন শামসুন আরা। সাবেরা খাতুনের স্বামী খ্যাতিমান সাংবাদিক কেজি মুস্তাফা। সেই সূত্রে সাবেরা খাতুন সাবেরা মুস্তাফা নামেই পরিচিত। সাবেরা মুস্তাফা অধ্যাপক এবং মঞ্চ ও বেতারের অভিনেত্রী ছিলেন। তাঁর পরে আবু হেনা মোস্তফা কামাল। ভাইবোনদের মধ্যে ছোট আবুল হায়াৎ মোহাম্মদ কামাল। বাংলাদেশ বেতারের আঞ্চলিক পরিচালক ছিলেন এবং গীতিকার হিসেবে তিনিও সুপরিচিত।

পাবনা জেলা স্কুল থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাস করেন আবু হেনা মোস্তফা কামাল। ১৯৫২ সালে পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের অধীনে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ১৩তম স্থান অধিকার করেন তিনি। ১৯৫৪ সালে ঢাকা কলেজ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ৭ম স্থান লাভ করেন। ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৯ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন আবু হেনা মোস্তফা কামাল। পরে ১৯৬৯ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'দ্য বেঙ্গলি প্রেস অ্যান্ড লিটারারি রাইটিং (১৮১৮-১৮৩১)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন তিনি।

আবু হেনা মোস্তফা কামালের কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৫৯ সালে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে প্রভাষক হিসেবে। তারপর চাঁপাইনবাবগঞ্জ কলেজে কিছু দিন শিক্ষকতা করেন। ১৯৬০ সালে যোগ দেন রাজশাহী সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগে। দুই বছর সেখানে ছিলেন। ১৯৬২ সালে তিনি প্রাদেশিক সরকারের জনসংযোগ বিভাগের সহকারি পরিচালক হয়ে ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অস্থায়ী প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। একই পদে স্থায়ী নিয়োগ পেয়ে ১৯৬৫ সালে যোগ দেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। পিএইচডি পর্যায়ে গবেষণার জন্য ১৯৬৬ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যান তিনি। পিএইচডি শেষে ১৯৭০ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসার পর তিনি রিডার পদে উন্নতি লাভ করেন। আবু হেনা মোস্তফা কামাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন ১৯৭৩ সালের ৫ অক্টোবর। সেখানে ১৯৭৬ সালে অধ্যাপক হন তিনি। ১৯৭৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৮৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন। ১৯৮৬ সালে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন। ১৯৫৬ সালের ২৫ অক্টোবর হালিমা খাতুনকে (ডাক নাম টুলু, পরবর্তীতে হালিমা মোস্তফা) নিয়ে দাম্পত্যজীবন শুরু করেন। আবু হেনা মোস্তফা কামাল ও হালিমা মোস্তফা দম্পতির পাঁচ সন্তান। সন্তানদের মধ্যে কাবেরী মোস্তফা কম্পিউটার প্রোগ্রামার, কাকলী মোস্তফা ইতিহাসবিদ, সুজিত মোস্তফা আধুনিক, সেমি ক্ল্যাসিক্যাল ও নজরুল সংগীতের শিল্পী, শ্যামলী মোস্তফা চিকিৎসক এবং সৌমী মোস্তফা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি ও পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ সমাপ্ত করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন প্রয়াত শিল্পী ও সুরকার আনোয়ারউদ্দিন খান এবং কবি, সঙ্গীতশিল্পী ও ক্রীড়াবিদ আসাফউদদৌলা। বন্ধু ছিলেন অকালপ্রয়াত সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী আবু বকর খান। এদের অনুপ্রেরণা তাঁকে সঙ্গীতমগ্ন করেছে।

পরবর্তীকালে তাঁর অনেক গানে কণ্ঠ ও সুর দিয়েছেন আনোয়ারউদ্দিন খান। এছাড়া শিল্পী ফেরদৌসী রহমানের কণ্ঠেও তাঁর অনেক গান দারুণ সফল হয়ে উঠেছে। আবু হেনার গানের সুরকারদের মধ্যে আছেন আব্দুল আহাদ, কাদের জামেরী, আবেদ হোসেন খান, মশিহ-উল-আলম, আবু বকর খান, মীর কাসেম খান, মনসুর আহমেদ, শেখ মোহিতুল হক, খোন্দকার নূরুল আলম, শেখ সাদী খান, অজিত রায়, রাজা হোসেন খান, প্রণব ঘোষ, দেবু ভট্টাচার্য, অনুপ ভট্টাচার্য, সমর দাস, জালাল আহমেদ, সৈয়দ আনোয়ার মুফতী প্রমুখ। আবু হেনা মোস্তফা কামালের লেখা অনেক গান তখনও যেমন রেডিও, টেলিভিশন ও গ্রামোফোনে শোনা যেত এখনও তেমন শোনা যায়।

বেঁচে থাকতে গানের কোনো সংকলন করেননি আবু হেনা মোস্তফা কামাল। মৃত্যুর পর ১৯৯৫ সালে তাঁর দুই শতাধিক গান নিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী প্রকাশ করে 'আমি সাগরের নীল' গ্রন্থ। তাঁর গানের সংখ্যা আরও অনেক বেশি। দুই হাজারের মতো গান লিখেছেন তিনি। আবু হেনা মোস্তফা কামালের অনেক গানের বিষয় হয়েছে প্রেম। এছাড়া তিনি গান লিখেছেন নিসর্গ, প্রকৃতি, উৎসব, দেশাত্ববোধ ও ভাষা নিয়ে। ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার বিন্যাসে পরিশীলিত সেসব গান। আবু হেনা মোস্তফা কামালের গান সম্পর্কে প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক ও সমালোচক আনিসুজ্জামানের মূল্যায়ন হচ্ছে- 'আবু হেনার কবিতার মতো গানেও প্রাধান্য পেয়েছে প্রেম। এক মোহমুগ্ধ, স্বপ্নচারী, আবেগময় সত্ত্বা ক্রিয়াশীল ছিল তাঁর অধিকাংশ গীত রচনার ক্ষেত্রে।'

বাংলাদেশের আধুনিক বাংলা গানে যেসব গানকে আমরা চিরসবুজ বলতে পারি সেসব গানের মধ্যে আবু হেনা মোস্তফা কামালের অনেক গান আছে। যেমন : ১) 'অনেক বৃষ্টি ঝরে/তুমি এলে যেন এক মুঠো রোদ্দুর/আমার দু'চোখ ভরে?' ২) 'সেই চম্পা নদীর তীরে/দেখা হবে আবার যদি/ফাল্গুন আসে গো ফিরে?' ৩) 'হাতের কাঁকন ফেলেছি খুলে/কাজল নেই চোখে' ৪) 'আমি সাগরের নীল/নয়নে মেখেছি এই চৈতালি রাতে' ৫) 'ভ্রমরের পাখনা যতদূরে যাক না ফুলের দেশে/তুমি তবু গান শুধু শোনাও এসে?' ৬) 'নদীর মাঝি বলে : এসো নবীন/মাঠের কবি বলে এসো নবীন' ৭) 'ওই যে আকাশ নীল হলো আজ/সে শুধু তোমার প্রেমে?' ৮) 'মহুয়ার মোহে গেল দিন যে/তোমার কাছে আমার কত ঋণ যে' ৯) 'অপমানে তুমি জ্বলে উঠেছিলে সেদিন বর্ণমালা/সেই থেকে শুরু দিন বদলের পালা?' ১০) 'তুমি যে আমার কবিতা, আমার বাঁশির রাগিনী' ১১) 'পথে যেতে দেখি আমি যারে' ১২) 'যায় যদি যাক প্রাণ, তবু দেবো না দেবো না দেবো না গোলার ধান' ১৩) 'এই পৃথিবীর পান্থশালায় গাইতে গেলে গান'। ১৪) 'তোমার কাজল কেশ ছড়ালো বলে/এই রাত এমন মধুর'।

১৯৬৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশ টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয়েছিল ফেরদৌসী রহমানের গাওয়া আবু হেনা মোস্তফা কামালের গান দিয়ে। গানের কথা ছিল, 'ওই যে আকাশ নীল হ'লো, সে শুধু তোমার প্রেমে'। চলচ্চিত্রের জন্যও অনেক গান লিখেছেন আবু হেনা। বাংলাদেশের যেসব চলচ্চিত্রে তাঁর গান ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দর্পচূর্ণ', 'যোগবিয়োগ', 'অনির্বাণ', 'সমর্পণ', 'অসাধারণ' ও 'কলমীলতা'। এর মধ্যে 'অসাধারণ' চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যও তাঁর রচনা। চলচ্চিত্রটির পরিচালক ছিলেন মুস্তফা আনোয়ার।

১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আপন যৌবন বৈরী'। আবু হেনা মোস্তফা কামালের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'যেহেতু জন্মান্ধ' প্রকাশিত হয় প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের দশ বছর পর অর্থাৎ ১৯৮৪ সালে। এর চার বছর পর (মৃত্যুর এক বছর আগে) ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর তৃতীয় এবং সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'আক্রান্ত গজল'। তিনটি গ্রন্থে মোট কবিতা আছে শতাধিক। এর বাইরে তাঁর আরও অনেক কবিতা অপ্রকাশিত থেকে গেছে। গান দিয়ে যেমন শ্রোতাকে মুগ্ধ করেছিলেন তেমনি কবিতা দিয়েও পাঠকের মন জয় করেছিলেন আবু হেনা মোস্তফা কামাল। সমালোচকরাও তাঁর কবিতার প্রশংসা করেছেন।

কবিতায় আবু হেনা মোস্তফা কামালের প্রধান অবলম্বন প্রেম ও নারী। কবিতার ছন্দের ক্ষেত্রে তিনি হেনা মোস্তফা কামাল গুরুত্ব দিয়েছেন কবিতাটির মেজাজকে। যে কবিতার মেজাজ যে রকম ছন্দও হয়েছে সেরকম।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট মানের প্রাবন্ধিক। কবিতা দিয়ে সাহিত্যে তাঁর যাত্রা শুরু হলেও প্রবন্ধ ও সমালোচনায় ছিলেন সবচেয়ে সফল। সমাজ ও সমকাল নিয়ে আবু হেনা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় অনেক কলাম লিখেছেন। দৈনিক বাংলা পত্রিকায় তিনি কলাম লিখতেন 'অমৎসর' ও 'দ্বিতীয় চিন্তা' নামে। সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বিচিত্রা'-য় লিখতেন 'অবান্তর কথকতা' নামে। 'চিত্রালী উপহার' পত্রিকায় লিখতেন 'অতিথির কলাম'। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'ধান শালিকের দেশ' পত্রিকায় 'ইছামতীর সোনালী-রূপালী' শিরোনামে নিজের ছেলেবেলার নানা ঘটনা লিখেছেন। আলবেয়ার ক্যামুর 'ক্যালিগুলা' নাটকটি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন তিনি। আবু হেনা মোস্তফা কামালের বিভিন্ন ধরনের গদ্য নিয়ে তাঁর মৃত্যুর পর ২০০০ সালে কথাসমগ্র নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে সময় প্রকাশন।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল ১৯৭৫ সালে 'আপন যৌবন বৈরী' কাব্যের জন্য ফরিদপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন সংস্থার আলাওল পুরস্কার, ১৯৮৬ সালে কবিতার জন্য যশোর সাহিত্য গোষ্ঠীর সুহৃদ সাহিত্যগোষ্ঠী স্বর্ণপদক, ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের একুশে পদক, ১৯৮৯ সালে সচেতনা সাহিত্য পুরস্কার ও আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্বর্ণপদক লাভ করেন। এছাড়াও পেয়েছেন সাদত আলী আকন্দ স্মৃতি পুরস্কার।

বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক থাকাকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ১৯৮৯ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩ টা ৪৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আবু হেনা মোস্তফা কামাল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। ঢাকার আজিমপুর নতুন কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন তিনি।

তথ্যসূত্র : বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত আনিসুজ্জামান ও বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত গ্রন্থ আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচনাবলী প্রথম খন্ড, সময় প্রকাশন থেকে প্রকাশিত আবু হেনা মোস্তফা কামালের রচনা সংকলন কথাসমগ্র গ্রন্থ, বাংলা একাডেমী প্রকাশিত শামসুজ্জামান খান, সেলিনা হোসেন ও জাকিউল হক সম্পাদিত একুশের স্মারকগ্রন্থ '৯০ থেকে। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে তথ্য ও অন্যান্য সহযোগিতা দিয়েছেন আবু হেনা মোস্তফা কামালের কন্যা কাবেরী মোস্তফা ও পুত্র সুজিত মোস্তফা।

লেখক : ষড়ৈশ্বর্য মুহম্মদ

সম্পাদক : **ঊর্মি লোহানী** প্রকাশক : গুণীজন ট্রাস্ট, মুদ্রণে : পাথওয়ে, অলংকরণ : আমিনুল ইসলাম যোগাযোগ : ৬/৮ হুমায়ুন রোড, ব্লক বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ। ই-মেইল : info@gunijan.org.bd
ওয়েব : www.gunijan.org.bd, ফোন : +৮৮০২৮১৫৬৭৭২, +৮৮০২৮১৪৬৫২৪৯৬-৭ ফ্যাক্স : +৮৮০২৮১৪২০২১